।।জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৩৫,আলাপ পুথি ৫।।

’গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি তুমি বন্দুককে ভয় না করো, তাহলে বন্দুক থেকে কিছুই বেরোবে না।’

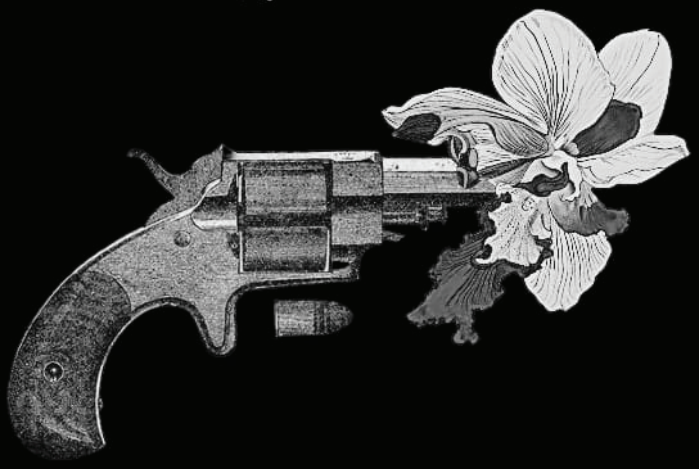

হিমাংশু কুমারের সঙ্গে
কথোপকথনে বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি
ভটাচার্য্য, তীর্থরাজ ত্রিবেদী

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা

হিমাংশু কুমারের সাক্ষাৎকার
Himangsu Kumarer Sakkhatkar

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে হিমাংশু কুমারে সাক্ষাৎকার প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

মধ্যভারতের গহিন অরণ্যের গভীর থেকে একটি আর্তনাদ আজ দেশের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। ছত্তিশগড়ের বস্তার, যে অঞ্চল তার অপরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ ও আদিবাসী সংস্কৃতির জন্য পরিচিত, সেই ভূমি আজ রাষ্ট্রীয় হিংস্রতা, কর্পোরেট লুঠেরা তাণ্ডব ও 'অপারেশন কাগার'-এর নামে চলমান এক নৃশংস সামরিক অভিযানের যাঁতাকলে পিষ্ট। এই যুদ্ধ আদতে ভারতরাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত 'জল-জঙ্গল-জমিন'-এর অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত ভূমিজ মানুষের বিরুদ্ধে। আর এই সংগ্রামের কেন্দ্রে রয়েছেন গান্ধীবাদী কর্মী হিমাংশু কুমারের মতো মানুষরা, যারা দীর্ঘদিন ধরে নিঃশব্দে থেকে, আশা ও প্রতিরোধের সুর বাজিয়ে চলেছেন।

'অপারেশন কাগার' শুধু একটি সামরিক অপারেশন নয়; এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রকল্পের হিংস্র চেহারা। এর লক্ষ্য, ভূমিজ জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় একছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে, ভূগর্ভের অফুরান খনিজ সম্পদ— লৌহ আকরিক, কয়লা, বক্সাইট, লিথিয়াম থেকে শুরু করে বিরল মৃত্তিকা ধাতু— বহুজাতিক কর্পোরেট শক্তির হাতে তুলে দেওয়া। এই লুণ্ঠনের পথে প্রধান বাধা হলো আদিবাসীদের সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার, বিশেষ করে পঞ্চম তফসিল, পেসা আইন, এবং বন অধিকার আইন। আর এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে যে রাজনৈতিক শক্তিটি ঐতিহাসিকভাবে মুখ্য ভূমিকা রেখে এসেছে, তা হল মাওবাদী আন্দোলন। ফলে, 'মাওবাদ দমন'-এর নামে আদতে দমন করা হচ্ছে সমগ্র ভূমিজ জনগোষ্ঠী ও তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে।

এই দমনের চরিত্র অত্যন্ত নির্মম। শত শত পুলিশ ও আধা-সামরিক ক্যাম্প, ড্রোন হামলা, বেয়নেটের খোঁচা, গণগুম, নির্মম হত্যা ও নারীর উপর যৌন হিংসা

হিমাংশু কুমারের সঙ্গে আলাপচারিতায় অত্রি ভট্টাচার্য, তীর্থরাজ ত্রিবেদী

আজ বস্তারের নিত্যদিনের চিত্র। মিডিয়া নামের প্রতিষ্ঠান এই সংঘাতকে 'জাতীয় নিরাপত্তা'-র সরলীকৃত ব্যাখ্যায় আটকে রেখেছে, যেখানে আদিবাসী হয় 'সন্ত্রাসী' নয়তো 'সন্ত্রাসীদের মানব ঢাল'। তাদের নিজস্ব সত্তা, সংস্কৃতি, বেঁচে থাকার সংগ্রামের জটিল বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।

এমনই এক সময়ে, হিমাংশু কুমারের কণ্ঠস্বর আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি কেবল মানবাধিকার কর্মী নন; তিনি একজন গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কর্মী, যার কাজের ভিত্তি অহিংসা ও সংলাপ। কিন্তু যখন তিনি বলছেন যে 'অপারেশন কাগার'-এর বিরুদ্ধে সংসদীয় বামপন্থা থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শক্তির যদি এখনই জোরালো প্রতিবাদ না ওঠে, তবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের পরবর্তী লক্ষ্য তারা নিজেরাই হবেন— তখন তা একটি গভীর সতর্কবার্তা। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'তিন শত্রু'— মুসলিম, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্ট— এর তত্ত্বের সূত্র ধরে দেখিয়ে দেন, বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের 'সামরিক হিন্দুত্ব'-এর প্রকল্পের লক্ষ্য হল সমস্ত প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির উচ্ছেদ।

এই প্রেক্ষাপটে, মাডভি হিডমা ও অমিত শাহ-এর দুটি পরস্পরবিরোধী 'উন্নয়ন মডেল'-এর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। একদিকে শাহ-এর মডেল, যা জনগণকে শোষণ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদের সমৃদ্ধি কামনা করে; অন্যদিকে হিডমাদের মডেল, যা ভূমিহীন কৃষককে জমি, ন্যায্য দাম ও মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করে সামগ্রিক জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ও বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃত উন্নয়নের পথ দেখায়। এই লড়াই শুধু বস্তারের নয়; এটি গোটা ভারতের ভবিষ্যতের লড়াই— কীসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ, তার লড়াই।

সিপিআই (মাওবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড বাসভরাজুর সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি, বিপ্লবী আন্দোলন কেবল অস্ত্রধারীর লড়াই নয়; এটি জীববৈচিত্র্য, আদিবাসীর কৃষিজ্ঞান, এবং প্রকৃতির সাথে সাযুজ্যের সংস্কৃতিকে রক্ষারও লড়াই। টাটা-আদানির মতো কর্পোরেট ঘরানা যখন ঐতিহ্যবাহী ধানের হাজারো জাত চুরি করে ও পাহাড় কেটে উজাড় করে দিচ্ছে, তখন এই আন্দোলন সেগুলোর অভিভাবকও বটে।

অতএব, হিমাংশু কুমারের সাথে আমাদের এই সংলাপ কেবল একটি বিশেষ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়। এটি একটি মৌলিক প্রশ্নের সন্ধান: যে রাষ্ট্র তার সবচেয়ে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেই রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক কী? যে উন্নয়নের নামে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হয়, তাকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করব? এবং সর্বোপরি,

ফ্যাসিবাদী সময়ে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের ভাষা ও কৌশল কী হবে?

এই সংলাপ তাই একটি জরুরি ডাক। বস্তারের রক্তরাঙা মাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, নিশ্চুপ থাকার সময় এবার শেষ। আমাদের ডাক তাই 'অপারেশন কাগার' প্রত্যাহার করো। ভূমিজ মানুষের অধিকার মানবাধিকার। খনিজ লুণ্ঠন নয়, জনসম্পদের ন্যায়বিচারপূর্ণ বণ্টন চাই। এই প্রতিরোধের স্পর্ধিত সুরেই আমরা হিমাংশু কুমারের সাথে কথা বলেছি— এক সাহসী কণ্ঠের সন্ধানে, যিনি এই প্রবল অন্ধকারে আলোর স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

অত্রি ভট্টাচার্য,

১২ই ডিসেম্বর, ২০২৫

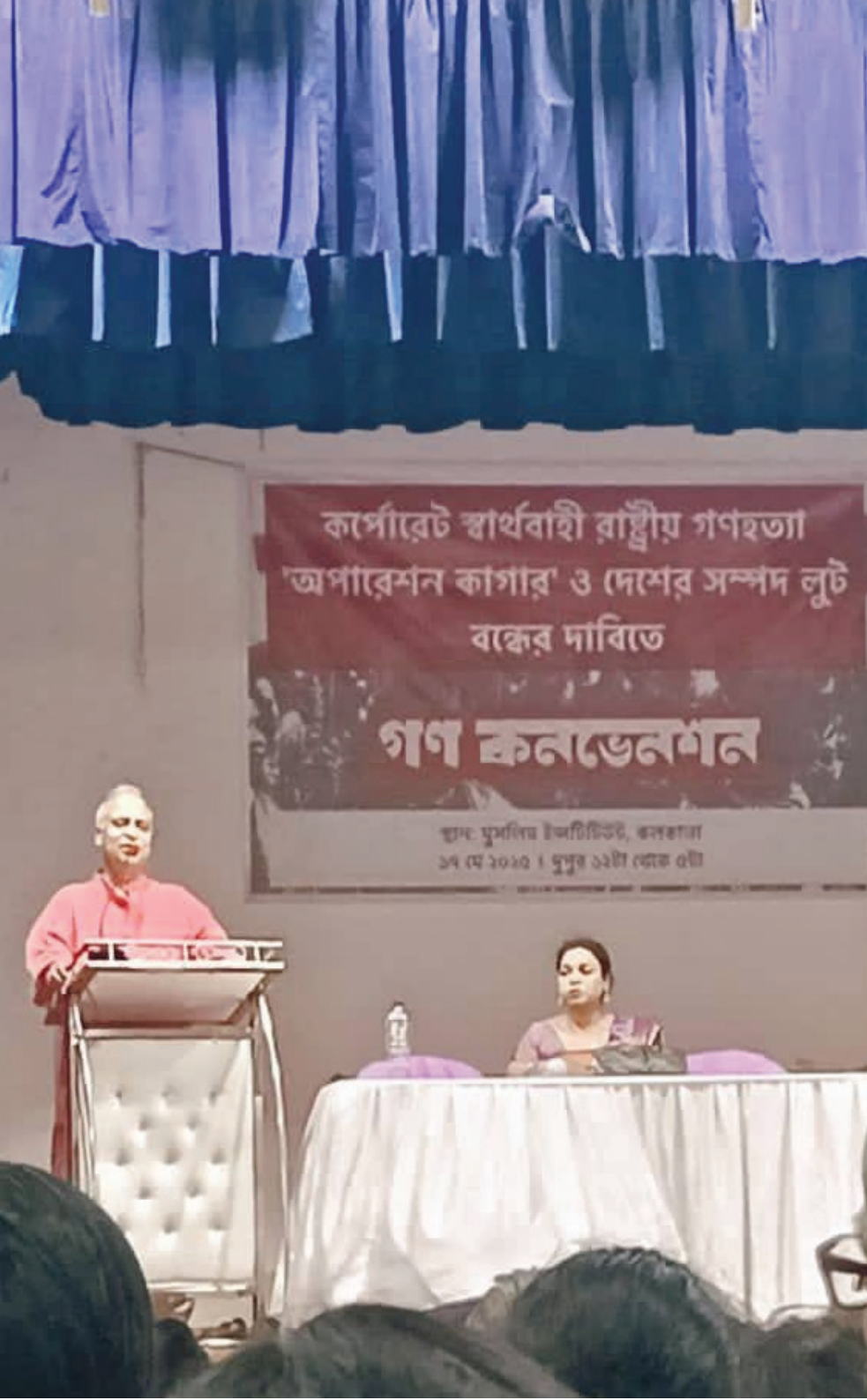
কর্পোরেট স্বার্থবাহী রাষ্ট্রীয় গণহত্যা
'অপারেশন কাগার' ও দেশের সম্পদ লুট
বন্ধের দাবিতে
গণ কনভেনশন

অত্রি ভট্টাচার্য আপনাদের সাথে গতকাল সংক্ষিপ্ত আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলা সম্ভব না হলেও, যতটুকু যা কথা হয়েছিল, সেখানে আমাদের কাজ সম্পর্কে কথা বলছিল আমাদের সাথী তীর্থ। তীর্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা যে অঞ্চলে বেশিরভাগ কাজ করি, তা হল উত্তরবঙ্গ। মূলতঃ দিনাজপুর। ওখানে যেসকল ঐতিহ্যবাহী কারিগর (Artisan) আছেন, যারা যেকোনো ধরনের শিল্প পরম্পরাগত ভাবে অনুশীলন করেন, তাদের কথাবার্তা, যাপন, কাজকর্ম রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে নথিভুক্ত করি। এইসমস্ত শিল্পীদের কাজ এবং তাদের জ্ঞানে তাদের রাজনৈতিক সত্ত্বার স্পষ্ট ছাপ আছে। যাদের কথা গত দু'দিনের আলোচনায় এবং আপনাদের বক্তব্যে বারংবার উঠে এসেছে, তারা সেইসমস্ত শিল্পী। আপনারা গ্রামের কথা বলছিলেন এবং গান্ধীর উক্তি তুলে ধরছিলেন। বলছিলেন, উন্নয়নের যে মডেলটি আছে সেটি ঔপনিবেশিকদের (colonial) থেকে আমরা পেয়েছি। সেটা এই কারিগরদের অর্থনীতি ধ্বংস করেই তৈরি হয়েছে। এখনও আমরা যারা মডার্ন পলিটির পার্ট, এই আমরাও একই ভাবে মডার্ন পলিটির অংশ, রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ– কারণ আমরাও কখনও ক্ষমতায় ছিলাম। আমরা এই অর্থনৈতিক অবস্থাকে একটি ত্রিভূজ (Triangle) হিসাবে দেখি। একদিকে আছে বিক্রেতা, আরেকদিকে আছে কারিগর ও অন্য আরও একদিকে আছে কৃষক। এই যে ত্রিভূজটি আছে, সেটা পশ্চিমবাংলা বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ক্রম ছিল, আগে যা বিশ্বের বাজারে পৌঁছত এবং এই অর্থনীতি খুব সমৃদ্ধ ছিল। বিশ্বেন্দু'দা-র থেকে আমরা শিখেছি। তিনি বেশ কয়েকবছর ধরে লাগাতার এই সংগঠন করছেন। বিশ্বেন্দু'দা একজন পাবলিক হিস্টোরিয়ান। উনি মুঘল ও সুলতানি যুগে বাংলায় যেসব কারিগর ছিল তাদের উপর কাজ করেছিলেন। কারিগরদের মধ্যে অনেকেই পৃষ্ঠপোষক ছিল। এখনকার পশ্চিমবাংলা যে এতটা বিভক্ত, এর সঙ্গেও আমরা লড়তে পারি এই অর্থনীতিকে সামনে রেখে। আপনারা তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসছেন, তাই আপনাদের

থেকে আমরা আরও জানতে চাই। বিশ্বেন্দু'দা-কে আমি অনুরোধ করব আমাদের কাজের বিষয়ে কিছু বলতে।

বিশ্বেন্দু নন্দ আমি মূলত কাজ শুরু করি ১৯৯৬ সালের দিকে। হকার ইউনিয়ন করতাম। তখন অপারেশন সানশাইন হচ্ছে। তখন থেকেই আমি উৎপাদন ও গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকি। সেই সময় থেকে আমি লক্ষ্য করি, আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনব্যবস্থা ঠিক কেমন চলছে। তখন আমরা বিভিন্ন বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম এবং কারিগরদের সঙ্গেও কাজ শুরু করি।

কারিগর বলতে আমি মূলত সেইসব মানুষকেই বুঝি, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কোনো না কোনো উৎপাদনকর্ম চালিয়ে আসছেন। প্রথমে আমি তাদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করি, পরে আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে কারিগরদের উদ্যোগেই একটি সংগঠন গড়ে তুলি। সংগঠনটির নাম হল বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘ।

এই সংগঠনের কাজ করতে করতে ২০০৯-২০১০ সালের দিকে আমার মানসিকতায় নতুন এক ধরনের ভিত্তি তৈরি হতে শুরু করে। আগে আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় এক ধরনের কর্পোরেটনির্ভরতার আস্থা ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আস্থা বদলাতে শুরু করে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করি, আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি আসলে অন্যরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর একটি ত্রিভুজের মতো কাঠামো: হকার, কারিগর ও চাষি। এই ত্রিভুজী উৎপাদনব্যবস্থা আসলে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জীবনধারার পক্ষে উপযোগী।

আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার বাবা-মা পার্টির হোলটাইমার। তাদের সাথে থেকে আমার সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিষয়ে একরকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখলাম, সেই ভাবনার জায়গা বদলে গেছে। এখনও এমন এক উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে আছে, যেখানে হাজার হাজার উৎপাদক আছে, হাজার হাজার বিক্রেতা আছে এবং হাজার হাজার ক্রেতা আছে। অর্থাৎ কর্পোরেট চাপ থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা জীবিত এবং কার্যকর।

আমরা যারা বামপন্থী, আমরা সাম্যের সমাজের স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্নের কাছাকাছি যাওয়ার জন্যই এই উৎপাদনব্যবস্থা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম, কর্পোরেটের চাপে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা গেল এগুলো এখনও টিকে আছে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ফুটপাথের হকার থেকে শুরু করে গ্রামীণ অর্থনীতির ভেতরে কর্পোরেটের প্রভাব বাড়ছে বটে, কিন্তু একচেটিয়া নয়। রাষ্ট্র নিজে কর্পোরেটদের রোজগারকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং আমাদের প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থার উপর চাপ তৈরি করছে। আসলে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ২৬৮ বছরের ইতিহাসে রাষ্ট্রের এই কাঠামো ক্রমাগত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। আজও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় আমরা দেখি, রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে কর্পোরেট স্বার্থের দিকে। সেনাবাহিনী না থাকলেও সাধারণ মানুষ প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।

সবুজ বিপ্লব, নতুন কারখানাভিত্তিক কাঠামো, গ্রামীণ কৃষির সংকট; এসবের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি ২০১৪-২০১৫ সালের দিকে সেই হকার-কারিগর-চাষীর অর্থনীতি চাপে আছে বটে, কিন্তু জীবিত। তখন আমরা 'পরম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করি। কারিগররাই সেখানে লিখতে শুরু করেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা জানান।

এই সময় থেকেই আমরা 'কারিগর' শব্দটাকে আবার তুলে ধরার চেষ্টা করি। উত্তর ভারতে যেমন এই শব্দ ব্যবহার হয়, আমাদের বাংলায় সেটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা 'হস্তশিল্পী' বলতাম, ইউরোপ থেকে ধার করা ধারণার মতো। কিন্তু আসলে কারিগররা সমাজের বাইরে নয়, বরং অর্থনীতির ভেতরে থেকেই টিকে আছেন।

আমাদের কাছে জ্ঞানচর্চা বলতে শুধু একাডেমিক গবেষণা নয়, মাঠঘাটে, বাজারে প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকেই আসা জ্ঞান। যেমন একসময় মসলিন, লৌহশিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা (চোখ ও নাকের

অপারেশন) ইত্যাদি আমাদের কারিগররা করতেন। এগুলো কঠিন প্রযুক্তি হলেও সাধারণ মানুষের নাগালের ভেতরেই ছিল। আমার জন্য পরীক্ষাগার হল মাঠ। যেখানে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নতুন পরীক্ষা চলে।

এভাবে আমরা 'জ্ঞানগঞ্জ' বা 'জ্ঞানের বাজার' গড়ে তুলি। আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞান কোনো বিশেষ ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কাছে সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞান আসলে বাজারে, মাঠে, মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

২০২৩ সাল থেকে আমরা আরেকটি কাজ শুরু করি। উপনিবেশ ও কর্পোরেটের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। আমাদের মতে, আজকের রাষ্ট্র কাঠামো আসলে উপনিবেশ কাঠামোরই এক্সটেনশন। কর্পোরেটকে বোঝা যাবে না উপনিবেশকে না বুঝলে। কারণ অন্তত ১০০ বছর আমরা কর্পোরেট আর কলোনিয়াল শাসনের অধীনে ছিলাম। তাই আমরা এই গবেষণাকে চার ভাগে ভাগ করি– ১৭৫৭ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত ১৭৯০ থেকে ১৮২০ পর্যন্ত। পরের পর্যায়গুলোতেও আলাদা সম্মেলন করি উদাহরণস্বরূপ, ১৭৮৪ সালে বাংলায় প্রায় ২৫ জন মহিলা জমিদার ছিলেন। তারা অনেকটাই স্বাধীনভাবে জমিদারি চালাতেন। কিন্তু ১৭৮৪ সালের আইন অনুযায়ী তাঁদের সম্পত্তি অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এর পরেই আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), যা জমিদারি ব্যবস্থাকে একেবারে পাল্টে দেয়। আমরা এইসব বিষয় নিয়ে সম্মেলন করি, আলোচনা করি। যেমন, ১৮৭১ সালের 'Criminal Tribal Act' কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছে, সেগুলিও আলোচনায় আসে।

আমাদের সংগঠন প্রতি মাসে একটি বই প্রকাশ করে, যেখানে এইসব বিষয়ে গবেষণা, সাক্ষাৎকার ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। যেমন:- আদিত্য নিগম : 'উপনিবেশ বলতে আমরা কী বুঝি?'; নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডা : মহিলাদের সম্পত্তি হারানোর ইতিহাস;অমিয় কুমার বাগচী : কলোনিয়াল অর্থনীতি আসলে ১৯০ বছরের 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি' ইত্যাদি

আমরা মনে করি, সেই উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো এখনও চলছে, বন্ধ হয়নি। আমরা খুব প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন নই। প্রতিষ্ঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে, ইতিহাস আর বর্তমানকে মিলিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। তরুণ প্রজন্মও (২৪-২৫ বছর বয়সী ছাত্র-যুবরা) আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামীণ কারিগর, চাষি, হকারদের কাঠামোই আসলে সত্যিকারের পরম্পরার ইতিহাস বহন করে। তারা শুধু উৎপাদক নয়, তারা প্রযুক্তির ধারক, জনপ্রযুক্তির স্রষ্টা। বাংলার সিল্ক শিল্প, ইস্পাতকর্ম, নৌ-নির্মাণ—সবই তার প্রমাণ। আগামী দিনে আমরা আরও চেষ্টা করব এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে, সংগঠন গড়ে তুলতে এবং বৈশ্বিক বাজারেও পৌঁছানোর মতো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে।

অত্রি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আরএসএস বর্তমানে ডিকলোনাইজেশন প্রোজেক্টের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে এবং সেটিকে ক্রমশ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। তাদের বক্তব্য হল— উপনিবেশিক যে কাঠামো এখানে কলোনিয়াল সময় থেকে রয়ে গেছে, সেটা আমাদের আইনি ব্যবস্থায় থাকতে পারে, আমাদের জীবনে থাকতে পারে, আমাদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তায় থাকতে পারে, এমনকি আমাদের সংবিধানেও থাকতে পারে। আরএসএস দাবি করছে, এই সমস্ত কিছু 'ঠিক' করার দায়িত্ব তাদের।

আমরা, যারা নিজেদের কলোনিয়াল স্টুডেন্টস বলে চিহ্নিত করি, আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই দাবি কাউন্টার করা। আর.এস.এস. বারবারই আমাদের 'মার্কস আর মেকলের বাচ্চা' বলে অপমান করে। তাই আমাদের দেখাতে হয়েছে, কারিগর ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমাদের যে আগ্রহ ও গবেষণা, তার ভিতরে রাজনৈতিক ভিত্তি আছে।

আমার এই আগ্রহের মূল কারণ— আমি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করেছি, ছাত্র সংগঠন পর্যায়ে সক্রিয় থেকেছি। পরে যখন বিশ্বেন্দু দাদার সঙ্গে আলাপ হলো, তখন মনে হলো যদি একই বিষয়টি আমরা

রাজনৈতিকভাবে বলি, অথবা কোনো রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে বলি, তাহলে এই ডিকলোনাইজেশন প্রোজেক্ট আর কর্পোরেট অর্থনীতির বিরোধিতা– এই দুটি বিষয়কে আমরা একসঙ্গে মিলিয়ে আনতে পারব।

আজকের দিনে যদি আরএসএস-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তাহলে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা উপনিবেশিক লেগ্যাসির বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি শরীরী বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও এই উপনিবেশিক ছাপ রয়ে গেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর আমরা যদি প্রশ্ন তুলতে না পারি, তাহলে বর্তমান সময়ে কোনো কার্যকর রাজনীতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আরএসএস সবসময়ই বলবে, 'আমরা নিউ এডুকেশন পলিসি বানিয়েছি, এর মাধ্যমে কলোনিয়াল শিক্ষা নীতি রোধ করেছি।' ওরা সংবিধান নিয়েও নিজেদের মত চাপিয়ে দেবে, আবার মনুস্মৃতির দিকেও ফিরে যাবে। অন্যদিকে আমাদের করণীয় হলো সেই জায়গায় কাজ করা। যেমন বিশ্বেন্দু'দা কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করছিলেন বাংলায় মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার একসময় স্বীকৃত ছিল, এমনকি ব্রাহ্মণরাও সেটা মেনে নিয়েছিল। এটি বাংলার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উদাহরণ।

আমরা যেই গবেষকের কথা বলছিলাম, নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার বই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, আজ আমরা যেসব ট্রাডিশন বলে জানি, সেগুলির অধিকাংশই আসলে কলোনিয়ালদের তৈরি করা প্রথা বা আইন। তারা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, "এটাই হলো ঐতিহ্য, এটাই হলো ট্র্যাডিশনের সংজ্ঞা।" তাই নতুন কোনো নিয়ম বা প্রথার দিকে আমরা সহজে যাই না।

উইলিয়াম জোন্স মনুস্মৃতি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, কারণ ব্রিটিশরা চেয়েছিল একটি একক আইনকানুন (Unifying Code), যার ভিত্তিতে তারা নতুন উপনিবেশ শাসন করতে পারবে। এই

কারণেই জোন্স এই অনুবাদ করেছিলেন। আর আজকের দিনে আরএসএস সেই মনুস্মৃতিকেই একক কোড হিসেবে ধরে নিয়ে গোটা ভারতকে শাসন করতে চায়। এটা আসলে উপনিবেশিক লেগ্যাসির ধারাবাহিকতা। কিন্তু দুঃখজনক হল, আমাদের অনেক প্রগ্রেসিভ বন্ধু এই বিষয়টিকে এইভাবে দেখেন না।

তারা প্রি-কলোনিয়াল ভারতকে অন্ধকারের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। আমার ধারণা, গান্ধীবাদীরা অন্তত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে দেখেন না, বরং অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের প্রয়োজন, ডিকলোনাইজেশন প্রোজেক্টের কাজ আমরা নিজেরাই করব, অন্য কারও হাতে সেটি হাইজ্যাক হতে দেব না।

এই নতুন ধরনের ভাবনা থেকেই আমরা আলোচনায় এসেছি। আপনারা যে জায়গা থেকে আসছেন, সেখানে দীর্ঘকাল ধরে রাজা-প্রথা ছিল। যেমন প্রবীর ভঞ্জদেও। ওনার আত্মজীবনী আমরা এখন অনুবাদ করছি। তাই প্রথম প্রশ্ন আমাদের হল, আপনারা প্রবীর ভঞ্জদেও কেমনভাবে দেখেন? এবং তিনি যতদিন ওই অঞ্চলে ছিলেন, স্থানীয় সমাজে তার প্রভাব কী ধরনের ছিল– সেটাই আমরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই।

হিমাংশু কুমার আমি দক্ষিণ বস্তারে কাজ করতাম এবং প্রবীর ভঞ্জদেও রাজধানী জগদলপুর ছিল। জগদলপুর আমাদের এখান থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। সেখানে তাদের সম্বন্ধে কিছু মিশ্র কথা আমরা শুনতে পেতাম। যারা শহরের মানুষ ছিল তারা রাজাকে খুব সম্মান করতেন কিন্তু যারা আদিবাসী ছিল, ওই আদিবাসীরা যখন প্রবীর ভঞ্জদেও দান্তেওয়াড়ায় একটা মন্দির বানালেন - দুর্গেশ্বরী মন্দির - যেটা খুব বিখ্যাত। ওই দান্তেশ্বরীর মূর্তিকে তিনি সঙ্গে করে ওড়িশা থেকে এনেছিলেন এবং এখানে স্থাপন করেছিলেন। তারপর চারিদিকে প্রচার হয় যে দুর্গেশ্বরী আদিবাসীদের দেবী ছিল, যাকে রাজা কোনো পাহাড় থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আদিবাসীরা বলেছিল যে, 'আমরা

মূর্তি পূজা করি না,' তারা বলত তারা পাথরকে পূজা করেন না। এবং দান্তেওয়াড়া যেই শহরটা ছিল, সেটারও রাজা নাম দিয়েছিলেন; দন্তেশ্বরী দেবীকে সেখানে স্থাপন করেছিলেন। ওখানকার আদিবাসীরা বলতেন যে ওই জায়গার আসল নাম হচ্ছে যাঁতাওয়াড়া। 'যাঁতা' মানে এক ধরনের গ্রাইন্ডার বা জাঁকি, সেটাকেই তারা যাঁতা বলত। প্রথম দিকে বানজারা যারা ছিলেন তারা খচ্চরে করে যাঁতা নিয়ে আসতেন। রাজস্থানের মানুষরা। তারা দান্তেওয়াড়ায়, এখন যেটা আছে, ওখানে একটা ময়দান ছিল। সেখানে তারা হাট বসাত, ওখানে তারা যাঁতা বিক্রি করত। এজন্য ওই অঞ্চলে নাম যাঁতাওয়াড়া। রাজা নিজের সংস্কৃতি, নিজের ধর্ম ওখানকার আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেন। আমরা যাদের সাথে কাজ করেছি, তারা এসব মানত না।

এখন আস্তে আস্তে আদিবাসীদের পুজো-আচ্চা, ফাগুনের সময়ের পরব, সে সবের সঙ্গে গ্রামের মানুষেরা জুড়ে পড়ে। দশেরা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাদেরকে ডেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, কাজকর্মের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।! যদিও আদিবাসীরা এসব মানত না, বলত এই উৎসবগুলো তাদের নয়।

মহেন্দ্র করমা, যে সারপঞ্চ ছিলেন, ওনার বাবা ছিল পরগনা মাঝি। মাঝিদের কাজ ছিল আদিবাসীদের থেকে খাজনা আদায় করা এবং সেগুলো রাজাকে দেওয়া। সেটা এক্সপ্লয়টেশনের একটা সেন্টার ছিল। আদিবাসী যারা তারা জঙ্গলে থাকত। তাদের রাজার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন ছিল এবং তাদের কোনো সুরক্ষার দরকার পড়ত না রাজার সেনাদের থেকে, নিজেদের মতো জঙ্গলে ছিল। কিন্তু রাজা তাদের থেকে ট্যাক্স নিচ্ছিল। একে আদিবাসীরা শোষণ মনে করত। আমি আদিবাসীদের থেকে রাজার সম্পর্কে কোনো ভালো কথা শুনিনি। রাজাদের উপর যে হামলা হয়েছে, যে রাজাকে মারা হয়েছে, যেসব আদিবাসী আশেপাশে ছিলেন, যাদের সঙ্গে রাজার খুব গাঢ় সম্পর্ক ছিল, তারা রাজার সাহায্য করেছিল। কংগ্রেস সরকার তাদেরকেও মেরেছিল, রাজাকেও মেরেছিল। এটাও সত্যি।

অত্রি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার একটা অনুবাদের কাজ প্রায় হয়েছে, যা এখন অনেকটাই হয়ে গেছে। ওখানে দেখা গেছে যে প্রবীর কংগ্রেসে ছিলেন; মাঝে মাঝে বলেছেন (এবং বইতেও লিখিত আছে) যে প্রথম থেকেই তিনি চাননি কোনো নকশালী বা কমিউনিস্ট এখানে এসে যাক। তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছেন, উনি ভয় পেয়েছিলেন এই ঘটনাটা। ওনার সঙ্গে যে ট্র্যাজেডি হয়েছিল সেটা পুরোটা মাসাকার।

আপনি কি মনে করেন যে ওই লোকাল গভর্নেন্স, যেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখনকার লোকাল গভর্নেন্সটি সার্বভৌম ছিল না? এবং তিনি কংগ্রেসের লোক ছিলেন, যেটাকে পূর্ব-উপনিবেশিকের সাথে সরাসরি মেলানো যায় না আমরা। আপনি কি মনে করেন, এই আক্রমণগুলো আসলে কি চেয়েছিল কংগ্রেস টিম বা কোনো সার্বভৌম শক্তি এখানে না থাকে? আপনার কি এমনটা মনে হয়? ওখান থেকেই তো শুরু হয়েছিল, তারপর আস্তে আস্তে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এই 'ডিপারচার' সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? ধরুন নকশালরা আসল, রাজা মারা গেল এবং মাঝখানের সময়টা; এই পরিস্থিতিটাকে কেন ভারতীয় রাষ্ট্র এভাবে নিয়ন্ত্রণ করল?

হিমাংশু নিশ্চয়ই, সেই সময় নতুন নতুন স্বাধীনতা এসেছিল, এবং রাজা ও তার লোকেরা নিজের চরম ক্ষমতা, নিজের শাসনের কথা বলতে শুরু করেন। আর দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি এটা মানতে পারছিলেন না যে কোনো এলাকা তার শাসনকে স্বীকার করছে না। আর সেই সময় পুরো ভারতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির শাসন করার যে ইচ্ছা ছিল প্রায় সবার মধ্যে, সেটা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়, দ্বন্দ্ব হয় এবং সেখানে গণহত্যা হয়েছিল। এবং একথা সত্য যে আদিবাসী এলাকার এক ধরনের প্রচলন ছিল যে তারা খুব বেশি শাসনে থাকতে পছন্দ করতেন না। তো সেটা রাজাদের সময় থেকেই দেখা দেয়, তারপর নকশাল বিদ্রোহের পরে তারপর আদিবাসীদের যে এলাকা ছিল যাকে 'লিবারেটেড জোন' বলা হয়ে থাকে। তবে আমার মনে হয় নকশালবাদীরা এটাকে পছন্দ করত না। কিন্তু তবুও সরকার

বলত যে 'লিবারেটেড জোন' আছে এবং এখানে ভারত সরকারের কোনো নিয়ম চলত না।

অত্রি বস্তারের বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু পরে আবার কথা বলব। আমার আরো একটি বিষয় খুব ভালো লেগেছিল যেটা কালকে দেখেছিলাম এবং আপনি বলেছেন, 'ভারত ছাড়ো' যে আন্দোলন হয়েছিল, যেসব যুবরা সেখানে ছিলেন, তাদের মধ্যে আপনার বাবাও ছিলেন। তো এখানে আপনার গান্ধীবাদের সঙ্গে যোগাযোগ কিভাবে হয়েছে? ছোটবেলায় একধরনের যোগসূত্র তৈরি হতেই পারে, কিন্তু আপনি নিজে সেটাকে কিভাবে দেখেছেন? আমরা যারা বাংলায় বড় হয়েছি, আমাদের এখানে গান্ধীবাদ একধরনের গালির মতো। আমরা গান্ধীবাদী নই। আমি অনেক পরে গিয়ে জানতে পারি যে এখানে অনেক প্রমিনেন্ট গান্ধীবাদী ছিলেন। এবং ওনারা বিভিন্ন লোক যেমন বিশ্বেন্দু'দা আমাদেরকে বললেন, তেমন অনেক জায়গায় রাজনৈতিকভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু এটা অনেকটা দেরিতে জানা গেছে। আমরা যারা বাম রাজনীতি করি, তাদের মধ্যে বাংলায় এক ধরনের বিভাজন ছিল– যেমন ধরুন বিভিন্ন দাঙ্গা, স্বদেশী আন্দোলন, তারপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আসেন, যেন দুটি ভাগ হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র বসু ও গান্ধীজীর মধ্যে। ঠিক এই কারণে আমাদের পক্ষে গান্ধীবাদ বোঝা একটু কষ্টকর। এইজন্য আমি জানতে চাই যে এটা আপনার সঙ্গে কিভাবে হল? এবং আপনি গান্ধীবাদী একজন মানুষ হিসাবে নিজেকে সমাজে কিভাবে নিয়ে এসেছেন?

হিমাংশু আসলে বাবার এক ধরনের প্রভাব এখানে আছে। বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনের পর বিনোবা ভাবের 'ভূদান আন্দোলন'-এ যোগ দেন। এবং ভূদান আন্দোলনে তাঁর যেসকল সাথী ছিলেন তারাও আমাদের বাড়ি আসতেন। এবং যারা সমাজ নিয়ে যেসব রাজনৈতিক আলোচনা করতেন সেগুলো আমরা শুনতাম। সেক্ষেত্রে বিষয়গুলো অনেকটা উপলব্ধির মধ্যে ছিল যে তারা একটা লজিক্যাল দিকে নিয়ে যেতেন, যেখানে 'গ্রাম স্বরাজ'-এর কথা বলা হত। এইভাবে সমাজ গড়া যেতে পারে। গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান আসবে,

তারা এমনটা বলতেন। আলোচনা শেষে প্রায়ই বলা হত, "হ্যাঁ, গ্রাম স্বরাজের মাধ্যমেই সবকিছু ঠিক হবে।" দুর্নীতি হোক, রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ হোক বা পুঁজিবাদের কথা হোক, গ্রাম স্বরাজই এসব সমস্যার উত্তর।

আমার তখন মনে হয়েছিল যে আমিও গ্রামে গিয়ে কাজ করব এবং এমন মডেল তৈরি করব, যার মাধ্যমে আন্তঃপর্যালোচনার কাজ হতে পারে। এই কারণেই আমি গ্রামে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এরপর আস্তে আস্তে এটাও বুঝতে পারলাম যে, গান্ধিকে নিয়ে এই ধরনের ভাবনার অভাব আছে, অথবা তাঁর রাজনীতিতে যে সঠিক চিন্তাধারা বর্তমান ছিল, সেটাকে কেউ ঠিক করে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। তেমন মানুষ নেই যারা বলতে পারবেন যে কেন এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

যেমন বিশেষ করে চরকাকে নিয়ে অনেক সময় মানুষ আক্রমণ করেন এবং বলেন যে ওটা দিয়ে কোনো স্বাধীনতা আসেনি—এটা শুধু অর্থহীন, এর বাইরে কিছু না। কিন্তু আমরা যদি চরকার রাজনীতিটা একটু খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে বুঝতে পারব যে গান্ধী ইংরেজদের ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক আগ্রাসন মোকাবিলা করার জন্য বলেছিলেন যে আমাদের বিভিন্ন স্বদেশী শিল্প, কারখানা ও শিল্পের প্রসার ঘটানো দরকার। কিন্তু এটার জন্য আমাদের কাছে তখন মেশিন, পুঁজি, প্রশিক্ষণ, বাজার, কিছুই ছিল না। তখন গান্ধী মনে করলেন যে ঠিক আছে, চরকা তখন ৫০ পয়সাতেই পাওয়া যেত। আর গ্রামে আমাদের তুলো আছে, খাদি আছে। বাজার আমাদের কাছে আছে, প্রশিক্ষণও আছে আমাদের। তাই তিনি চরকাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

এবং একই সঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন, "চরকা আমরা তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি।" তিনি আরও বলেছিলেন, বিদেশি বস্ত্র জ্বালিয়ে দাও। অনেকে তখন বলতে শুরু করলেন যে তিনি পাগল হয়ে গেছেন। লোকের কাছে কাপড় নেই, তিনি বলছেন জ্বালিয়ে দিতে! কিন্তু গান্ধী

জানতেন, যতক্ষণ বিদেশি কাপড় থাকবে ততক্ষণ চাহিদা তৈরি হবে না। তাই তিনি বলতে থাকলেন, কাপড় জ্বালাতে হবে। তিনি বলতেন, যদি কাপড় একটাও না থাকে, তখন মানুষ খাদি তৈরি করবে এবং সেটাই পরবে। তিনি এই চাহিদাটা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আর এটাকেই তিনি প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে দেখতেন। যারা চরকা চালাচ্ছে, তারা আসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বার্তা বহন করছিল, চরকা ছিল তার প্রতীক। চরকা থেকে সুতো কাটা হত, কাপড় তৈরি হত।

এরপর গান্ধীর ট্রেন যেখানে যেত, সেখানে চারিদিকে বৃদ্ধ, বাচ্চা, নারী, সবাই তাঁর পেছনে দৌড়াত। বাচ্চারা চরকা নিয়ে বসে থাকত, অনেক কিলোমিটার জুড়ে লাইন থাকত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ চরকা চালাত। এই দৃশ্যগুলো এক ধরনের রাজনৈতিক বার্তা ছিল, "এতোগুলো মানুষ তোমার বিরুদ্ধে।"

গান্ধী যেতেন আনন্দভবন। নেহরুদের পিতৃপুরুষের বাড়ি। তাঁরা অর্ধেক বাড়িই হাসপাতালকে দান করে দেন নিজের মায়ের নামে, 'সরস্বতী হাসপাতাল'। সেখানে গান্ধীকে ডাকা হয়েছিল উদ্বোধনের জন্য। গান্ধী ছয় ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছান। হাজার হাজার লোক বসে ছিল। গান্ধীজী আসেন এবং মাত্র একটি বাক্যে বক্তৃতা দেন– "আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার দেরি হয়ে গেছে। আপনারা সবাই চরকা চালাবেন, ওটার মাধ্যমেই ফল আসবে।" এটুকু বলেই চলে যান। ঠিক পরের দিন হাজার হাজার চরকা বিক্রি হয় এবং সবাই চরকা চালাতে শুরু করেন।

তিনি চরকাকে প্রতিরোধের প্রতীক বানান। এবং তার সাথে সাথে গান্ধীজী সাধারণ মানুষের বুক থেকে ইংরেজদের বন্দুক আর জেলের ভয়ও বার করে দেন। তিনি বলতেন, মৃত্যু গর্বের বিষয়, জেলে যাওয়া গর্বের বিষয়। আর তিনি যখন জেলে যেতেন, পুরো গ্রাম ঢাকঢোল বাজিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিত। ফেরার সময়ও তাঁকে নিতে যেত। তিনি যেন জেলের ভয় দূর করে দিয়েছিলেন, মানুষের মন

খুলে দিয়েছিলেন।

একটা কথা আছে, “Power comes from the barrel of a gun.” গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি তুমি বন্দুককে ভয় না করো, তাহলে বন্দুক থেকে কিছুই বেরোবে না। এরপর ইংরেজরা গুলি চালালেও মানুষ ভয় পাচ্ছিল না, জেলে পুরে দিলেও মানুষ ভয় পাচ্ছিল না। ইংরেজদের দমননীতি গান্ধীজী দমন করে দিয়েছিলেন।

এইরকম অনেক উদাহরণ আছে। ভগৎ সিংকে নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে অনেক বিতর্ক ওঠে, যে গান্ধী চাইলে ভগৎ সিংকে বাঁচাতে পারতেন। সেটাও ভুল। গান্ধী অনেক চেষ্টা করেছিলেন ভগৎ সিংকে বাঁচানোর জন্য অনেক চিঠি লিখেছিলেন, সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। আর ফাঁসির পর ভগৎ সিংয়ের বাবার ভাষণ আছে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, “গান্ধী আমাদের সেনাপতি, আমাদের যুবদের তাঁর কথামতো চলা দরকার।”

সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এটা আলাদা বিষয় যে সুভাষচন্দ্র যেভাবে জাপান ও জার্মানিতে গিয়েছিলেন, সেটা কতটা রাজনৈতিকভাবে সঠিক এবং যদি জার্মানরা এখানে আসত, তাহলে কী হত, এইসব বিষয় আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার। অন্যদিকে গান্ধীকে যেভাবে ইতিহাসের খলনায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাকেও আমাদের পুনরায় ভাবতে হবে।

আম্বেদকর এবং গান্ধীর মধ্যে যে বিতর্কটা ছিল, সেটাকেও খুব ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইংরেজরা যখন ১২টা কমিউনিটি আলাদা আলাদা ভোটাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, যার মধ্যে রাজা ছিল, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, মুসলিম ছিল, শিখ ছিল, দলিত ছিল। যদি সেটা কার্যকর হত, তাহলে আজ আমাদের সংসদ ১২টি শাখায় বিভক্ত হত। তখন গান্ধী বলেছিলেন; না, একটা সংসদ, এক ভোট। ব্রাহ্মণও দলিতকে ভোট দেবে। আমরা জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়ব। আমরা স্থায়ীভাবে বিভক্ত সংসদ চাই না। তিনি এটা মানতে চাননি।

এরজন্যেও অনেকে গান্ধীকে খলনায়ক হিসেবে দেখেন, যে তিনি দলিতদের ভালো চাইতেন না। কিন্তু আজ আমাদের কাছে সম্ভাবনা আছে যে আমরা দেশে জাতব্যবস্থা শেষ করতে পারি, প্রতিষ্ঠান থেকে সংবিধান পর্যন্ত। তাই আমাদের সঠিক চোখ দিয়ে দেখতে হবে। গান্ধীজি সব ক্ষেত্রেই খলনায়ক নন।

দেখুন, আমরা পোস্ট-গান্ধী, পোস্ট-মার্কস, পোস্ট-ভগৎ সিং, পোস্ট-আম্বেদকর– আমরা সবার থেকেই কিছু না কিছু অনুপ্রেরণা নিতে পারি, শিক্ষা নিতে পারি এবং আজকের সময়ে আমাদের রাজনীতি স্থির করতে পারি। কারও সঙ্গে ঘৃণা, কারও সঙ্গে তুলনা করার আগে আমাদের একটু বুঝতে হবে।

দীর্ঘ সময় ধরে কমিউনিস্টরা আম্বেদকরকে অস্বীকার করেছে, গান্ধীকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু এখন আবার পুনরায় ভাবা দরকার। যেদিন থেকে আরএসএস দুই ধারার উপর আক্রমণ চালিয়েছে, কমিউনিস্টরাও দ্বিতীয়বার ভাবতে শুরু করেছে।

ভগত সিং এবং গান্ধীজিকে নিয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা সাধারণভাবে ভগৎ সিংকে বিপ্লবী, চরমপন্থী ভাবি, গান্ধীজিকে নরমপন্থী। কিন্তু বিষয়টা এত সরল নয়। ভগত সিং যখন ছাত্র ছিলেন, লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তখন তাঁর হাতে কোনো সংগঠন বা গণভিত্তি ছিল না। তখন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ভুলবশত অন্য একজনকে হত্যা করেন, এমনকি একজন দলিত সিপাহীকেও। পরে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন, সংগঠন পান, সাথী পান, জনতার সমর্থন পান। এরপর তাঁর কর্মকাণ্ডে বদল আসে। সংবাদপত্রে লিখতে থাকেন, জাতীয় পরিষদে যান এবং সেখানে এমন বোমা নিক্ষেপ করেন যা প্রাণঘাতী নয়, প্রতীকী। পরে তিনি গ্রেপ্তার হন, দীর্ঘ অনশন করেন এবং লিখেন, ক্রান্তি মানে শুধু বোমা-পিস্তল নয়, নতুন ধারার চিন্তা ও সংগ্রাম।

গন্ধীজি অহিংসা ও সত্যাগ্রহের দর্শন মেনে চললেও হিংসার বিষয়ে তাঁর অবস্থান একমাত্রিক নয়। তিনি বলেছিলেন অহিংসা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু

কাপুরুষত্বের চেয়ে হিংসা শ্রেষ্ঠ। মানুষকে কাপুরুষ (কায়র) হতে তিনি মানা করেছেন। আশ্রমের এক তরুণী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, ধর্ষণের চেষ্টা হলে কী করা উচিত? উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন, তরোয়াল তুলে প্রতিরোধ করো, আমি তোমাকে অহিংসার প্রমাণ দেব। ১৯০৯ সালে তিনি ট্রাস্টিশিপ তত্ত্ব দিয়েছিলেন, যেখানে পুঁজিপতিরা নিজের সম্পদ স্বেচ্ছায় ভাগ করবে, কিন্তু ১৯৪৪ সালে লুই ফিশারের কাছে সাক্ষাৎকারে বললেন, কৃষক জমি দখল করতে পারে, জমিদার পালিয়ে যেতে পারে, ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে গান্ধীজির অবস্থান বদলাচ্ছিল, স্বাধীনতার পর আরও ভিন্ন দিকেও যেতে পারতেন। বক্তা বলেন, গান্ধীজি স্থির নয়, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। ভগত সিংকেও শুধু হিংস্র বিপ্লবী বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়।

অত্রি পি সি যোশীর সঙ্গে তাঁর যে চিঠি আনা-প্রদান হয়েছিল, সেটা অন্য ধরণের আলাপ ছিল। গান্ধী তাঁকে বাতিল করে দেন নি, তিনি যোশীর মত নতুন যে সব কমিউনিস্ট আসছেন, তাদের বুঝতে চাইছেন, তাদের রাস্তা-ভাবনা আঁচ করতে চাইছেন। আপনি কলকাতায় দুদিন ধরে আছেন, অপারেশন কাগার নিয়ে কথা বলার জন্য। রাষ্ট্র যে ইন্টেন্সিটিতে আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা অনেক প্রবল। কাগার নিয়ে আপনি এখানে আমাদের এত শিক্ষিত করলেন, এরপরে আপনি আরো ৭/৮টা শহরে যাবেন সচেতনতা বাড়ানোর জন্য। আপনার কাছে অপারেশন কাগার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কেন আমাদের সকলকে অপারেশন কাগারের বিরুদ্ধাচরণ করতেই হবে।

হিমাংশু অপারেশন কাগার কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, গভীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। রাষ্ট্র আদিবাসী এলাকায় সামরিক হামলা চালিয়ে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করছে। এরপরে এই আঘাত অনাদিবাসী মানুষের জীবনে আসবে - স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি, জল, বিদ্যুতের মতো খাতে বিস্তার পাবে - সে সব বেসরকারীকরণ করা হবে। উদাহরণ দেখুন, মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে বিপুল বিল দিতে হচ্ছে। আগে যেখানে ২০-৩০

টাকার বিল আসত, এখন ৭০০-৯০০ টাকা। এটা ছড়িয়ে দেওয়া হবে সারা দেশে। কাগার তো নতুন কিছু নয়। আমাদের বলে দেওয়া হচ্ছে নতুন ধরণের সময় আসছে। সালভা জুডুমের মডেল অনুসরণ করে গভর্মেন্ট চালাতে চাইছে। মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে। গো-রক্ষা, রোমিও স্কোয়াড ইত্যাদির আড়ালে কর্পোরেট এজেন্ডা চাপানো হচ্ছে, সমাজ বিভক্ত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরও বড়ভাবে চাপানোর চেষ্টা চলছে।

অত্রি বাস্তবে যখন আপনার আশ্রম গুঁড়িয়ে দেওয়া হল, তখন আমি দেখেছি, সেটার নাম ছিল বনবাসী চেতনা আশ্রম। সঙ্ঘ মনে করে আদিবাসীই বনবাসী। আমি বলছি না আপনি এই রাস্তায় ভাবেন। কিন্তু আমায় জানতে হবে বনবাসী কেন বলেন?

হিমাংশু আমি যখন বাস্তারে গেলাম আমার সঙ্গে যে সব সাথী ছিলেন, তারা আদিবাসী, ওবিসি এবং দলিতরাও। সকলের সঙ্গে সংগঠন বানানোর জন্য কথা বললাম। তারা বলল শুধু আদিবাসী নাম না রেখে বনবাসীও রাখ। কারন বাস্তারে তাই শুধু 'আদিবাসী' নেই, 'বনবাসী'ও আছে। তাই বন্ধুরা বললেন বনবাসী নাম রাখতে। যারা জঙ্গলে বসবাস করে, তাদের সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। পরে জানলাম, আরএসএসও 'বনবাসী' বলছে, আদিবাসীরা প্রকৃত মূলবাসী নয় বোঝানোর জন্য। তাদের মতে ব্রাহ্মণই প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী, ধর্ম চালু করেছে, আসল স্বদেশী। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভারতকে আদিবাসীদের মূল নিবাসী হিসেবে স্বীকার করেনি। আমার মতে, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে, তাদের অধিকার খর্ব করতে আরএসএস আদিবাসীদের বনবাসী বলে চিহ্নিত করছে। এবং তারা ইচ্ছাকৃত বলেছে। একবার শব্দটা জনপ্রিয় হয়েগেলে তাকে পরিবর্তন করা সমস্যার। কিন্তু আমার সারা জীবন তাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।

অত্রি আমরা জানি আপনার লড়াইএর কথা। কিন্তু আপনার কি মনে হয় সঙ্ঘ যে আদবাসী, বনবাসীর মধ্যে পার্থক্য করছে সেটা কতটা জায়েজ -

অর্থাৎ লব্জের পার্থক্যের রাজনীতিকে কিভাবে দেখেন?

হিমাংশু তারা বলতে চাইছে ভারতের মূল নিবাসী আদিবাসী নয়। এই দেশে সবার আগে ব্রাহ্মণ এসেছে। তারাই হিন্দু ধর্মের শুরু করেছে। ওদের বক্তব্য, মূল নিবাসীরা তো আমরাই। আমাদের সংবিধানেও আদিবাসীদের মূলনিবাসী স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজ তো আমরা জানি ব্রাহ্মণেরা বাইরে থেকেই এসেছে।

তীর্থরাজ ত্রিবেদী আপনি বক্তৃতায় বলছিলেন, আইন জনগণের জন্য তৈরি হয়েছে। সেটা রাষ্ট্রের জন্য নয়। একটি মামলার উদাহরণে এই কথাটা বলছিলেন। আমাদের বাংলায়, শিল্পবিপ্লব চলাকালীন গোটা পৃথিবীতে আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা -এই প্যাকেজটা আসছে ১৯ শতের নবজাগরণের সময় থেকে; এখনও পর্যন্ত তার প্রভাব বজায় রেখেছে। তো সেই শিল্পবিপ্লবীয় সভ্যতা যে আকার পেয়েছে, তাতে গ্রামের মানুষ ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। এখন গ্রামের মানুষ গাছের তলায়, পাড়ায়, বাজারে পাবজি খেলছে। অনেকেই বলছেন এটা আটকাতে পারবেন না। সে সেটা ব্যবহার করবেই। কিন্তু আমরা যেটাকে প্রভিলেজ বলে জানছি, সিভিলাইজেশন আমাদের প্রিভিলেজ হিসেবে যা দিচ্ছে... জঙ্গলে আদিবাসীরা জল জঙ্গল জমিন রক্ষার জন্য লড়াই করছে। কিন্তু শহুরে ভদ্রলোকেরা এই যুদ্ধের অনেক বাইরে। আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোকেদের কাছে জমি নেই, জঙ্গল নেই। তাই তারা একে রক্ষা করার অর্থ এখনও বোঝেনা। গ্রামের লোকেরা শহরকে দেখে আকর্ষিত হয়। যে বিপ্লবী আন্দোলন চলছে সারা ভারতজুড়ে, সেখানে মর্ডান সিভিলাইজেশনকে আমরা কীভাবে দেখব তার কোনও স্পষ্ট জবাব নেই। এর ফলে ভদ্রলোক সমাজ ভোগবাদী অসুস্থতায় ভুগছে। শহরের ফ্ল্যাটে ঘেঁষাঘেঁষি, জল কিনে খাওয়া, বছরে একবার বনভ্রমণ। তাদের মনে হয় তারা সংগ্রামের বাইরে। বাস্তবে আধুনিক সভ্যতার এই উন্নয়ন (যেমন সাইকেল বিতরণ, যাতায়াত) গ্রামীণ সমাজকে ভেঙে দিয়েছে, মানুষকে শহরমুখী করেছে। প্রোগ্রেসের এই ধারণা পুঁজি তৈরি করেছে। অথচ বামপন্থী রাজনীতিতে মডার্ন

সিভিলাইজেশন সমালোচনা কম। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা এই আধুনিক সভ্যতাকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করব? বোঝাব কীভাবে এই ভোগবাদী অগ্রগতি ধ্বংস ডেকে আনছে?

হিমাংশু এটা বামপন্থীদের একটা সমালোচনার জায়গা। মার্ক্সবাদেও পরিবেশ সম্পর্কে তেমন কিছু বলা নেই। মনে করা হয়, এই সংকটের বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না, তিনি জানতেন না যে এমন ধরনের সংকট আসবে। এটা হল প্রথম বিষয়। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী (State capitalist)। সেখানে ছোট দস্তকারদের (কারিগরদের) বিষয়ে, যে শাসনকেন্দ্রিক অর্থনীতি আছে, সে বিষয়ে কিছু বলা নেই। যেসব সম্পদ আছে, সেগুলো রাষ্ট্রের, আর রাষ্ট্র সেগুলো পরিচালনা করবে– এই ধারণাই মুখ্য হয়ে আছে। সেখানে যে গ্রামের অর্থনীতি আছে, গ্রামের জীবনযাত্রা আছে, যেটাকে আপনি ঐতিহ্যবাহী বলছেন, সেটা কিভাবে সংরক্ষণ করা যাবে? কিভাবে রক্ষা করা যাবে? কারণ এটা শুধু এক ধরনের জীবনযাত্রা নয়, বরং এক ধরনের মূল্যবোধ। আর সেই মূল্যবোধগুলো কমিউনিটি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবকিছু বাদ দেওয়া যাবে না। অবশ্যই জাত, পিতৃতান্ত্রিক উপনিবেশবাদ– এসব বাদ দিতে হবে। কিন্তু এর বাইরেও এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো বাঁচানো ও সুরক্ষা করা দরকার হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে আমাদের বামপন্থীরা খুব একটা ভাবেনি।

আপনি যেমন বলছিলেন, গ্রামের জীবনকে একরকম 'অন্ধকারের যুগ' ধরে নেওয়া হয়েছে। নেহরু পর্যন্ত একই কথা বলেছেন, আম্বেদকরও বলেছেন, এমনকি মার্ক্সবাদীরাও বলেছেন। শুধু গান্ধী বলেছিলেন যে গ্রামগুলোকে সংস্কার করতে হবে, যুবকদের গ্রামে যেতে হবে, জাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। তিনি এ ধরনের যাবতীয় কথাই বলছিলেন এবং বলছিলেন, এই গ্রামগুলোকে তখনই বাঁচানো সম্ভব।

আম্বেদকর অন্যদিকে বলছিলেন যে দলিতদের গ্রাম থেকে বেরিয়ে

আসা দরকার। কারণ গ্রামে শোষণ বেড়ে গেছে। তাই তারা শহরে চলে এলেন। কিন্তু শহরে এসে তারা শ্রমিক হয়ে গেলেন, আর আজ তারা সবচেয়ে বেশি শোষিত। আপনি যদি পুঁজিবাদের বিরোধী না হন, বরং পুঁজিবাদের মাধ্যমেই সমাধান খোঁজেন, তাহলে সেটা শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধ্বংসই করবে। আপনি একটি ছোট সমস্যার সমাধানের জন্য আরও জটিল, বড় সমস্যাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আমরা সেদিকেই যাচ্ছি।

এখানে আমি গান্ধীকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি। তিনি বলছেন, নতুন পুঁজিবাদের বিরোধিতা করতে হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন করতে হবে। তিনি বলছেন, কুটির শিল্পকে রক্ষা করতে হবে। এবং কম ট্যাক্সের মধ্যেই এইসব কাজ চালাতে হবে। তিনি আরও বলছেন, যেসব ঐতিহ্যগত জ্ঞান ছিল। যেমন, একটা পরিবারে বংশপরম্পরায় কাঠের কাজ হয়, সেগুলো ধরে রাখতে হবে।

কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সংকীর্ণ চিন্তাগুলোর অবসান ঘটাতে হবে। যেমন, উঁচুজাত-নীচুজাত ভেদাভেদ ও ঘৃণা, এগুলো অবশ্যই শেষ করতে হবে। কিন্তু আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী কাজগুলো আছে, সেগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এখন অনেকেই বলছেন যে এগুলোকে সমর্থন করতে হবে।

অত্রি আপনাকে ছোট দুটি প্রশ্ন করে শেষ করব। একটা বিষয় আমার জানার ছিল, আমরা আজকের কথোপকথন শুরু করেছিলাম বর্তমান পুঁজিবাদ নিয়ে। আজকের পুঁজিবাদ তো নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তুলছে। এখন আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি। এমনকি দুই-তিন-চার বছর আগে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও বলেছিল, একটা বড় রূপান্তর হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসছে। পুঁজিবাদ এখন মানুষের শরীর নিয়েও ভাবছে। মানুষের শরীরকে কিভাবে পরিবর্তন করা যায়, মানুষকে অর্ধেক মানুষ-অর্ধেক মেশিনে পরিণত করা সম্ভব কি না।

এমতাবস্থায় আপনি যে জায়গায় থাকেন সেখানে কারিগরদের জীবন

কেমন? একদিকে যুদ্ধ চলছে, কিন্তু সেখানে এখনও অনেক দক্ষ মানুষ আছেন। তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা দক্ষতার ধারা আছে। বিশ্বেন্দু'দার কাছে শুনেছি, ওখানকার মানুষ অনেক আগে থেকেই লোহা-ইস্পাতের কাজ করে আসছেন। ওখানকার কারিগরদের জীবন কেমন? সেটাকে রক্ষা করাও তো এখনকার এই সংগ্রামের একটি মূল পয়েন্ট হতে পারে। কারণ এই সংস্কৃতি ও কারিগরি জীবন নিজেই এক ধরনের অর্থনীতি। আপনি একে কিভাবে দেখেছেন?

হিমাংশু হ্যাঁ, আমি তাঁদের সঙ্গে কাজও করেছি। ওখানে মাটির কাজ আছে; মাটির খেলনা, মাটির পাত্র বানানো। এছাড়া পিতলের কাজ আছে, লোহার কাজ আছে, লাঠির কাজ আছে, বাঁশের কাজ আছে। এগুলোর উন্নয়নের জন্য আমরা লোক পাঠাতাম, বাঁশের ট্রেনিং দিতাম এবং সেই দিয়ে জিনিসপত্র বানানোর কাজ চালু করেছিলাম। তাঁদের মার্কেটিং সাপোর্টও আমরাই করতাম। তাঁরা এখনও কাজ করছেন। বিশেষ করে মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে কণ্ডাগাঁও, কাকি, জগদলপুর – এই সব জায়গায়।

তবে সংঘর্ষ মূলত বাইরের অঞ্চলে হয়। সংঘাত দেখা যায় সুকমা, বিজাপুর, দান্তেওয়াড়া এলাকায়। কিন্তু তাঁদের কাজ চলছে। সমস্যা হলো, এখন পুরো বাজারের আধিপত্য তৈরি হয়েছে। বাজারই ঠিক করছে কী দরকার, কতটা দরকার, কী ধরনের দরকার। ডিজাইনও বাজারের চাহিদা মেনে তৈরি হচ্ছে। পুরোটাই বাণিজ্যিক হয়ে গেছে। সেখানে কিছু ঠিকাদার এসেছে, এনজিও-রাও ঢুকেছে।

অত্রি আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লাগছে। গান্ধী-আম্বেদকরকে নিয়ে যেসব তর্ক আছে, সেগুলোর সমাধান আমাদের নিজেদের মতো করে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যদি একটা সম্মেলন করি, সেখানে আপনি যেমন বললেন, গান্ধী, আম্বেদকর, ভগত সিং, তাঁরা আমাদের আগেই এসেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে যেমন শেখার আছে, তেমনই

তাঁদের ভুল থেকেও শিক্ষা নেওয়ার আছে। আর সেই ভুলগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। আপনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার মূল্যায়ন করতে হবে।

আমার প্রশ্ন হলো – আপনি যেহেতু গান্ধীবাদী, ভারতে যে মার্ক্সবাদীরা আছেন, তাঁদের বিষয়ে একটা ভালো দিক বলুন। এমন কিছু, যা আপনাকে আকৃষ্ট করে, যেখানে মনে হয়, এটাই মার্ক্সবাদীদের বড় অবদান আমাদের সমাজে। আর গান্ধীবাদীদের একটা ভুল বলুন, যেটা আপনার মতে একেবারেই করা উচিত হয়নি।

হিমাংশু বামপন্থীরা যেভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে, সেটা আমার খুব ভালো লাগে এবং আকর্ষণ করে। আমাদের যে দীর্ঘ সময়ের ঐক্য বা মিত্রতা আছে, সেটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেই ছিল। তাঁদের সাহায্যে দীর্ঘদিন আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করেছি। একদিকে তাঁরা আমাদের বন্ধু। আর যেভাবে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে ধরে রেখেছে, সেটাও আমার ভালো লাগে।

অন্যদিকে গান্ধীবাদীদের ভুলের কথা বললে বলব– তাঁরা দৃঢ়ভাবে জাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে, দলিতদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেননি। এটা একটা বড় ভুল। এখন তো অনেক তথাকথিত গান্ধীবাদী আছেন, তাঁরা উপনিবেশবাদের প্রশ্নেও অনেকটা উদাসীন। কোনো স্পষ্ট পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। এজন্য এখন তাঁদের কথা কেউ তেমন শোনে না। বেশিরভাগ গান্ধীবাদী পুরনো গান্ধী-প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পত্তি রক্ষাতেই ব্যস্ত। জনতার কাছে যান না।

অত্রি আমাদের একটি উদ্যোগ আছে, আশা করি শুনে আপনার ভালো লাগবে। আমরা দেশীয় পদ্ধতিতে তুলা চাষ শুরু করেছি। কোনো কীটনাশক নয়, কোনো হারভেস্টার নয়। যেভাবে উপনিবেশবাদের আগে চাষ হত, আমরা সেইভাবে তুলা চাষ করছি। আমরা চাইছি এই পদ্ধতি একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করুক। একদিকে থাকবেন কৃষক, যারা ফসল ফলাবেন। অন্যদিকে থাকবেন মহিলা তাঁতিরা। যারা আমাদের ইতিহাসেও চরকা কাটার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেছিলেন।

তাঁদের অনেক চিঠি পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যায় তাঁরা প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু উপনিবেশিক অর্থনীতি সেটাকে ভেঙে দেয়। তখন তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলেন, বলেছিলেন, এসব আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না, এটাই আমার সবকিছু। কিন্তু পরে তাঁরা অসহায় নারী হয়ে পড়েন। আর পঞ্চাশ বছর পর তাঁরা একেবারেই ভিন্ন অবস্থায় পৌঁছে যান।

আমরা চাইছি সেই কাজগুলো আবার ফিরে আসুক। মহিলা শ্রমিক হিসেবে তাঁতিরাও ফিরে আসুক। সুতো কাটা, চরকা কাটা আবার ইকোসিস্টেমের ভেতর ফিরুক। এই কাপড় আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরব, তবে সেটা পুঁজিবাদী প্ল্যাটফর্মের মতো নয়। আমরা চাইছি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক স্তর তৈরি করতে এবং পাল্টা বার্তা দিতে।

আমরা একে বিশ্ববাজারেও নিতে চাই। আর এটাই বলতে চাই। বাংলায় একসময় এসব হত, আবার সেটাই ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এখানে গান্ধী আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। আমরা চাই, এটুকু হোক।

কথাবার্তা চলতে থাকবে। বিস্তারিত তথ্যও আসবে। এখন মৌখিক পর্যায়ে আছে। তাঁতের কিছু ভিডিও আছে। উত্তর দিনাজপুরে এখনও কিছু ঘরে তাঁতিরা কাজ করেন। তাঁদের ভিডিও আমরা তুলেছি, আপনি দেখতে পারবেন। এটা এক ধরনের ঐতিহ্য, যেটাকে আমাদের সমর্থন করতে হবে, বাঁচাতে হবে।

এটা শুধু কাঠামোর প্রশ্ন নয়। আগে যেমন চরকার কাঠামো ছিল, এখন সেটাও নেই। চিনির ক্ষেত্রেও নেই। আমাদের আবার সেসব তৈরি করতে হবে, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কর্পোরেট স্বার্থবাহী রাষ্ট্রীয় গণহত্যা
ও দেশের সম্পদ লুঠ বন্ধ করো!

জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
'অপারেশন কাগার' বন্ধের দাবিতে

বিভিন্ন গণ সংগঠনের ডাকে

গণ কনভেনশন

স্থান: মুসলিম ইন্সটিটিউট, কলকাতা
১৭ মে ২০২৫ । দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

কর্পোরেট স্বার্থবাহী রাষ্ট্রীয় গণহত্যা
'অপারেশন কাগার' ও দেশের সম্পদ লুট
বন্ধের দাবিতে
গণ কনভেনশন
স্থান: মুসলিম ইন্সটিটিউট, কলকাতা
১৭ মে ২০২৫ । দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ভারতের জনগণের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্র যে সংঘাতমূলক আচরণ শুরু করেছে, তার হিংস্রতম রূপ হল মধ্যভারতের বুকে নকশালপন্থী দমনের নামে চালানো 'অপারেশন কাগার'। সেই কর্পোরেট স্বার্থবাহী রাষ্ট্রীয় সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে গত ১৭ই মে, ২০২৫ কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে বহু গণসংগঠনের আহ্বানে আয়োজিত হয় গণকনভেনশন। উপস্থিত ছিলেন বস্তারের সংগ্রামী সংবাদ-কর্মী, মানবাধিকার কর্মীরা। অসামান্য বক্তব্য রাখেন বস্তার অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে থেকে ভূমিজ মানুষের সাথে নিরলস কাজ করে যাওয়া গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কর্মী হিমাংশু কুমার। বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্রশিল্পী সঙ্ঘ এবং জ্ঞানগঞ্জের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে এই উদ্যোগের প্রতি সংহতি জানান অত্রি ভট্টাচার্য।

সিপিআই (মাওবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড বাসভরাজু'র সাথে আলফ ব্রেনানের সাক্ষাৎকার- (ক্রান্তি পত্রিকা: অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০২২)

'প্র: আপনার দল এবং পিএলজিএ যেসব এলাকায় কাজ করে, তার অনেক এলাকায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ এবং বনজ প্রাণী। এই অঞ্চলগুলির সুরক্ষা এবং পরিবেশ ধ্বংসকারী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের বিষয়ে দলের সাধারণ অবস্থান কী?

কমরেড বাসভরাজু: আমাদের দলের নেতৃত্বে যেসব এলাকায় বিপ্লবী আন্দোলন চলছে, সেসব এলাকা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলগুলি, তাদের ঘন বন এবং জীবন্ত নদীগুলির সাথে, অগণিত উদ্ভিদ প্রজাতি, ঔষধি ভেষজ, বন্যপ্রাণী, রঙিন পাখির প্রজাতি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পোকামাকড়, নদী এবং খালের জলজ প্রাণী, উভচর প্রাণী, শত শত প্রজাতির মাছ, বনে পাওয়া কয়েক ডজন ক্ষুদ্র বনজ পণ্য, বিভিন্ন ধরণের কন্দ, ফল, ফলদায়ক গুল্ম এবং গাছ এবং হাজার হাজার জাতের ধান, ডাল, তৈলবীজ এবং শস্যের আবাসস্থল যা ঐতিহ্যবাহী উপায়ে সংরক্ষিত। মূল্যবান, বিস্ময়কর, অনন্য, সুষম এবং প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী এবং বন্ধু পুঁজিপতিদের কাছ থেকে প্রচণ্ড হুমকির মুখে রয়েছে। শোষক শাসক শ্রেণীর জনবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী-স্পন্সরিত নীতির কারণে এই জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে । মুষ্টিমেয় দেশি-বিদেশি শোষকদের মুনাফালোভীর জন্য প্রকৃতিকে বলি দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতির ভারসাম্য

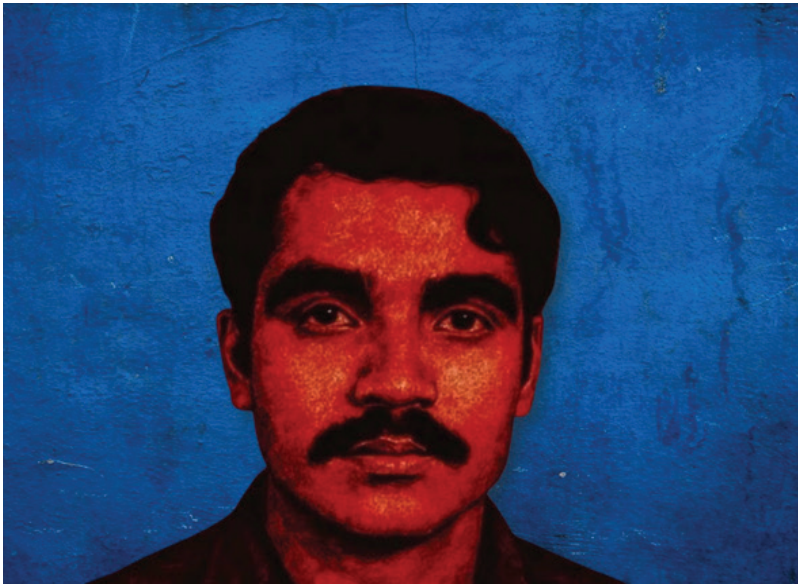

রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পদের সুষম ব্যবহার।

তবে, পরিবেশ সুরক্ষা এবং প্রকৃতির ভারসাম্য, অন্যদিকে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সম্পদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রমাগত লড়াই করতে হবে। এই সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে।

সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলি কীভাবে আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে তার উদাহরণ দেখুন! ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের শত শত গ্রামের হাজার হাজার কৃষকের কাছ থেকে কৃষি বিজ্ঞানী ড. ১৯৫০ এবং ষাটের দশকে রিচারিয়া ২২,০০০ এরও বেশি ধানের জাত এবং ১,৮০০ এরও বেশি শাকসবজি সংগ্রহ করেছিলেন এবং বর্তমান ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জীবাণু ভাণ্ডার সংরক্ষণ করেছিলেন। অনেক জাত আছে, যার মধ্যে রয়েছে কম জলে জন্মানো, কম ঘাস উৎপাদনকারী, বেশি ঘাস উৎপাদনকারী, সুগন্ধযুক্ত, লম্বা, খাটো এবং বছরের যেকোনো সময় জন্মানো যায় এমন জাত। তবে, আমাদের দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের যোগসাজশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ধানের এই জার্মপ্লাজম চুরি করে নিয়ে যায়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি এই চুরি করা জাতগুলিকে বিভিন্ন নামে (IR-36, IR-72, ইত্যাদি) ভারত সহ অনেক দেশে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে, দাবি করছে যে এগুলি ম্যানিলার আন্তর্জাতিক বৃষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRA) এ তৈরি করা হয়েছে। প্রতি বছর বীজের জন্য তাদের বহুজাতিক কোম্পানির উপর নির্ভর করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

হাজার হাজার জাতের বীজের বিকাশ এবং সংরক্ষণের পিছনে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। বিশ্বের এটা জানা উচিত। ছত্তিশগড় রাজ্যের কৃষকরা আকতি নামক উৎসবটি উদযাপন করেন। সেদিন, সমস্ত যুবক-যুবতীরা উন্মত্তভাবে বেরিয়ে পড়ে এবং প্রতিটি বাড়ি থেকে শস্য ভিক্ষা করে। তারা গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত শস্য সংগ্রহ করে গ্রামের বাজারে রোপণ করত। ফসল পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, কিছু নতুন জাত স্বাভাবিকভাবেই আবির্ভূত হয়। তারপর তারা সেগুলো আলাদাভাবে সংগ্রহ করত এবং ফসল কাটত। এভাবে, প্রতি বছর, প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নতুন জাতের ধান উৎপাদিত হত। সুতরাং, প্রতিটি গ্রাম একটি কৃষি গবেষণাগার, প্রতিটি কৃষক একজন কৃষি বিজ্ঞানী, ইত্যাদি, যার সবই এখনও বিদ্যমান। এই দেশে উন্নয়ন সত্ত্বেও, বহুজাতিক কোম্পানিগুলি প্রক্সি সরকারের সহায়তায় এই

ধরণের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি চুরি এবং আত্মসাৎ করছে। আজও, স্থানীয় ধানের জাত, শস্যদানা, কন্দ, শাকসবজি, ফলের বীজ ইত্যাদি শত শত জাতের এখনও নিম্নভূমির উপজাতীয় অঞ্চলে আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত। কর্পোরেট কোম্পানিগুলির খপ্পরে পড়া থেকে তাদের রক্ষা এবং সংরক্ষণ করার প্রয়োজন।

সাধারণত, পাহাড়, বন, বিশেষ করে উঁচু ও প্রশস্ত পর্বতশ্রেণী এবং প্রশস্ত ও ঘন বন মৌসুমি বায়ুর চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, বস্তারের রাওয়াঘাট পাহাড় মৌসুমি বৃষ্টিপাতের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। পরিবেশবিদরা বলছেন যে এই খনিগুলি খনন করলে বর্ষার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, যার ফলে কেবল বাস্তারেই নয়, দক্ষিণ ছত্তিশগড়েও বৃষ্টিপাত হ্রাস পাবে এবং দেশের পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য এই ঢিবিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে, টাটা এবং আদানির মতো মধ্যস্বত্বভোগী এবং স্বৈরাচারী পুঁজিপতিরা এগুলি খনন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে নিতে আগ্রহী। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এর জন্য সর্বাত্মকভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। পরিবেশে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, দীর্ঘস্থায়ী চরম তাপের ফলে খরা, অকাল বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটছে। সাম্প্রতিক এক অনুমান অনুসারে, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা শীঘ্রই ২৭ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে। তারা আরও লম্বা হতে চলেছে।

এছাড়াও, ইলেকট্রনিক পণ্য শিল্প বৃদ্ধি এবং পণ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলে বিকিরণ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অপ্রত্যাশিত রোগ দেখা দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের নিজস্ব মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতকে সম্প্রসারণ করছে, সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের জন্য মানুষকে শোষণ করছে। লুণ্ঠনকারী সরকারের মদদে, বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের নামে জনসাধারণের তহবিল লুট করা হচ্ছে।

আমাদের দল বন, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ, যার মধ্যে সমস্ত জীবন্ত প্রজাতিও রয়েছে, রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের দলের নেতৃত্বে, পিএলডিএ, পাবলিক সংগঠন এবং আরপিসি (বিপ্লবী গণ সরকার) জনগণের সাথে একসাথে এর জন্য কাজ করছে। তারা মানুষকে শিক্ষিত করছে। আমাদের সরকারি সরকারের বন সংরক্ষণ বিভাগ বিশেষভাবে এই বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছে। আমরা যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের বিরোধিতা করব যা মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করে। আমরা দেশের পরিবেশবিদ, জীববিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, গণতন্ত্রবাদী, নাগরিক অধিকার সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এবং উপজাতি সম্প্রদায়কে এর জন্য আমাদের

সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। পরিশেষে, আমরা বলছি যে একদিকে, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য, আমাদের দেশব্যাপী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত এবং বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা উচিত। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদী গণযুদ্ধের মাধ্যমে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে গঠিত নতুন গণতান্ত্রিক ভারতে বন, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের নিশ্চয়তার ভিত্তি স্থাপন করা হবে।'

(মূল তেলুগু থেকে অনুবাদ করার জন্য ধন্যবাদ লাল সংবাদ ফেসবুক পেজকে)

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা, বাংলার হাট; কিভাবে আজকের যুবা কথামৃত বুঝছে; বনজঙ্গল গাছপালা, আর নয় অঙ্গার এবং বর্তমান পুথি হিমাংশ্য কুমারের সাক্ষাৎকার

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা
৩৪। আর নয় অঙ্গার - আদানির কয়লা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক প্রস্তাবনা
৩৫। হিমাংশু কুমারের সঙ্গে কথোপকথন

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা